রবীন্দ্র উপন্যাসে মুসলিম সমাজ (ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে সমকালের প্রতিস্থাপন)

আমিনুল ইসলাম

উনিশ শতকের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালের বাংলা সাহিত্যে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান-জীবন উপেক্ষিত থেকে গেছে। এই উপেক্ষার বিস্তার একেবারে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো লেখকও এই সংকট খুব একটা অতিক্রম করতে পারেননি। যদিও রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অংশের জীবনচিত্রণ বাংলা সাহিত্যে আজো যথাযথ প্রতিফলিত হয়নি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন—কবি জসীমউদ্দিন, মহুম্মদ মনসুরউদ্দীন, আবুল ফজল সহ আরও অনেকের কাছে। এঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে শুধু সম্প্রদায় বিশেষের জীবন চিত্রায়ণ হতে থাকলে তা সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উর্ধ্বে উঠতে পারবে না—তাকে জাতীয় সাহিত্য বলা যাবে না। 'হিন্দুর বিশিষ্ট আচার পদ্ধতি, নিজের বিশেষভাবে পৃথিবীকে দেবার ভঙ্গির যেমন বাঙলা সাহিত্যে স্থান আছে, মুসলমানের রীতিনীতি অনুষ্ঠান, তার বিশিষ্ট মানসচিত্রের বাংলা সাহিত্যে ঠিক সমানই স্থান।' (আবুল ফজল, 'বাংলা ভাষার আরবি-ফারসি শব্দ : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ,' 'সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন' ঢাকা, পৃ. ১৮৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সর্বপ্রথম সুদুর ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে মুসলমানকে উদ্ধার করে সমকালে স্থাপন করলেন। রবীন্দ্র পূর্বকালের সাহিত্য যে মুসলমান ছিল আগন্তুক 'যবন'' পররাজ্যলোলুপ, বিজাতীয় শত্রু বিশেষ, সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেই মুসলমানকেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রতিবেশী হিসেবে দেখা গেল। এখানে মুসলমান সমাজ মহিমান্বিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৯৮৮) উপন্যাসে এই চেতনার সূত্রপাত। উপন্যাসটি মুঘল - হিন্দু দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে রচিত হলেও, লেখক এখানে দুই পরস্পবিরোধী, যুযুধান পক্ষকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতেই বিচার করেছেন—এখানে তিনি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে চিহ্নিত করেননি দুই সম্প্রদায়কে। বরং এই উপন্যাসে তিনি মুঘল সম্রাটের বিপক্ষ প্রতাপাদিত্যেকেই সমধিক সমালোচনা করেছেন। প্রতাপাদিত্যের সাম্রাজ্যস্পৃহাকে রবীন্দ্রনাথ সুনজরে দেখেননি, তীব্র সমালোচনার বিদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি লেখার সময় নানা প্রতিকূল সমালোচনায় কন্টকিত হয়েছিলেন। আমরা এই তথ্য জেনে অবাক হই যে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি লিখেছিলেন। সমকালে তিনি উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য - বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য সমালোচিত হলেও, পরে প্রমাণিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের অভিমত হচ্ছে : 'স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময় বাংলাদেশের আদর্শ বীর চরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলছিল। এখানে তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময় তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি, তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অংসকোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড; বউ ঠাকুরাণীর হাট : সূচনা, পৃ. ৩৭১)

লক্ষণীয় এই যে, ভারতের শত্রু 'ম্লেচ্ছ' বলে উল্লেখ করলেও প্রতাপাদিত্য শুধুমাত্র মুঘলকেই প্রতিপক্ষ ভেবেছেন, পাঠানকে নয়। শুধু তাই নয়, প্রধান জ্ঞাতিশত্রু বসন্ত রায়কে হত্যার দায়িত্ব কোনো বাঙালিকে প্রতাপাদিত্য দেননি, দিয়েছেন বিশ্বস্ত পাঠান হোসেন ভ্রাতৃদ্বয়কে। এ-সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যায়, পাঠানেরা প্রতাপাদিত্যের কেমন বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বসন্ত রায়ের ঘাতক হিসাবে আর্বিভূত হয়েছেন হোসেন খাঁ। কিন্তু নামেই সে ঘাতক, কাজে ঠিক তার বিপরীত। সে একজন কবি। ফারসি কবিতায় তার বেশ দখল। যদিও হোসেন খাঁ একবার এই উক্তি করেছেন যে, ইতিপূর্বে সে বহু-খুনোখুনি করেছে। কিন্তু এ-কথা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কেননা তার চরিত্রে ঘাতকের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই—আছে কবির স্বভাব। মানুষ খুন করার চাইতে মানুষকে ভালোবাসাই তার প্রকৃতি। সঙ্গীতপ্রিয় বসন্ত রায়ের সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল। তাই এদের সখ্যতা হতে বিলম্ব হয় না। জীবনরসিক বসন্ত রায়ের কবি-প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে ঘাতক হোসেন খাঁ অপরাধবোধে পিষ্ট হয় : 'তোবা, তোবা, এমন কাজও করে! কফেরকে মারিলে পুণ্য আছে বটে কিন্তু সে পুণ্য এত উপার্জন করিয়াছি যে পরকালের বিষয়ে আর বড়ো ভাবনা নাই। কিন্তু ইহকালের সমস্তই যে প্রকার বেবন্দোবস্ত দেখিতেছি, তাহাতে এই কাফেরটাকে না মারিয়া যদি তাহার একটি বিলিবন্দোজ করিয়া লইতে পারি তাহাতে আপত্তি দেখিতেছি না।

তারপর সে বসন্ত রায়ের কাছে তার ও তার সহোদরের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে ক্ষমা চায়। সঙ্গীতপ্রিয় বসন্ত রায়কে সে বলে : 'তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।' এরপর হোসেন খাঁ প্রকৃতই বসন্ত রায়ের মিত্র হয়ে ওঠে। এই ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ তার সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করে এবং উদয়াদিত্যের কাছে সে স্বীকার করে যে, প্রতাপাদিত্যের হুঙ্কারে বাধ্য হয়েই সে হীনকার্যে সম্মত হয়েছিল।

বসন্ত রায়ের প্রতি হোসেন খাঁর আর্জি পরবর্তীতে আরো গভীর হয়। উপন্যাসের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে পুনরায় তার আবির্ভাব হয়। বসন্ত রায় তখন চতুর্দিক থেকে শত্রু পরিবৃত। হতাশা আর অনিশ্চিয়তা তাকে ঘিরে ধরেছে। এমন সময় একদিন হোসেন খাঁ তাঁর কাছে আসে সান্ত্বনা দেবার জন্য। চেহারায় মলিনতার কারণ জিজ্ঞাসিত হলে হোসেন উত্তর দেয়, 'আপনাকে (বসন্ত রায়) মলিন দেখিয়ে আমাদের মনে আর সুখ নাই।...মহারাজ, আমরাই বা কে, আপনি না হাসিলে আমাদের হাসিবার ক্ষমতা কী? আমাদের আর সুখ নাই, জনাব।' এইভাবে ঘাতক হোসেন খাঁ খুনী থেকে প্রেমিকে পরিণত হয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় মুসলিম চরিত্র হোসেন ভ্রাতা। পঞ্চম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ তাকে দিয়ে কৌতুক রস জমিয়েছেন।

উপন্যাসের তৃতীয় মুসলীম চরিত্র মুক্তিয়ার খাঁ। যুবরাজ উদয়াদিত্যকে বন্দী ও বসন্ত রায়কে হত্যা করতে প্রতাপাদিত্যের নির্দেশে সে

রায়গড়ে এসেছে। এমন নৃশংস কার্যভার পেলেও মন তার পাষণ নয়। হত্যার হুকুমনামা নিয়ে বসন্ত রায়ের কাছে উপস্থিত হলে, বসন্ত রায় সলজ নয়নে বলেন যে, একদিন এই প্রতাপদিত্যকে তিনি সন্তান স্নেহে লালন করেছেন, তখন 'মুক্তিয়ার খাঁর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, সে অধোবদনে চুপ করিয়া দাঁড়ইয়া রহিল।' কিন্তু সে যে 'আদেশপালক ভৃত্যমাত্র,' কর্তব্যে অবহেলার দায়ে তার মৃত্যুদন্ড অনিবার্য। মুক্তিয়ারের এই মানবিকতা বসন্ত রায়ের চক্ষু এড়িয়ে যায়নি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় উদয়াদিত্যের যাবতীয় ভালোমন্দ দায়িত্বভার তিনি মুক্তিয়ারের হস্তেই অর্পণ করেন। বলেন, 'দেখো খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম। সে নিরপরাধ-দেখিয়ো অন্যায় বিচারে সে যেন আর কষ্ট না পায়।'

নিরীহ ভালোমানুষ পাঠানের অন্নসংস্থানের জন্য ভারতে এসে কিভাবে এই অনভিপ্রেত কার্যে লিপ্ত হয়ে যেত এবং কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় বিদ্ধ হত হোসেন খাঁ ও মুক্তিয়ার খাঁ তার বাস্তব উদাহরণ।

উপন্যাসের চতুর্থ মুসলিম চরিত্র আব্দুল। মুক্তিয়ার স্বহস্তে বসন্ত রায়কে হত্যা করতে পারেনি, আব্দুলের সাহায্য নিয়েছে : 'মুক্তিয়ার খাঁ ডাকিল, 'আবদুল।' আব্দুল মুক্ত তলোয়ার হস্তে আসিল। মুক্তিয়ার মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত পরেই পরেই রক্তাক্ত হস্তে আব্দুল গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। গৃহে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল।'

সার্বিক 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। উপন্যাসের মুসলমান -চরিত্রগুলির রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের কখনওই বিদ্বেষ-প্রসূত হয়নি। এখানে মৃত্যুর প্রাক্-মুহূর্তেও হিন্দু বসন্ত রায় মুসলমান মুক্তিয়ার খানকে আন্তরিক আলিঙ্গন করেছে। আমরা সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি উদ্ধৃত করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন !

'মুক্তিয়ার খাঁ ঘরের বাহিরে গিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। বসন্ত রায় আহ্নিক সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মুক্তিয়ার খাঁর গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খাঁ সাহেব ভালো আছ তো?'

মুক্তিয়ার সেলাম করিয়া সংক্ষেপে কহিল, 'হ্যাঁ মহারাজ।'

বসন্ত রায় কহিলেন, 'আহারাদি হইয়াছে।'

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা হ্যাঁ।

বসন্ত রায়। আজ তবে তোমার এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দি।

মুক্তিয়ার কহিল, 'আজ্ঞে, না প্রয়োজন নাই। কাজ সারিয়া এখনই যাইতে হইবে।'

বসন্ত রায়।, না, তা হইবে না খাঁ সাহেব, আজ তোমাদের ছাড়িব না। আজ এখানে থাকিতেই হইবে।

...

মুক্তিয়ার। ...মহারাজার একটি আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী আদেশ? এখনই বলো।'

...

বসন্ত রায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'এ সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই, এসো সাহেব, তোমার আদেশ পালন করো।'

মুক্তিয়ার তখন মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে কহিল, 'মহারাজ আমাকে মার্জনা করিবেন—আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র, কোনো দোষ নাই।'

বসন্ত রায় কহিলেন, 'না সাহেব, তোমার দোষ কী? তোমার কোনো দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জনা করিব কী?' বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁর কাছে গিয়া তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন : কহিলেন, 'প্রতাপকে বলিয়ো, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখো খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম। সে নিরপরাধ—দেখিয়ো অন্যায় বিচার সে যেন আর কষ্ট না পায়।'

এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গিমচন্দ্র যেখানে অনিবার্যভাবে হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষকে বিশেষায়িত করে তুলেছেন, তুই প্রতিপক্ষকে সাম্প্রদায়ক বিভেদে জর্জরিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সুযোগ পেয়েও সে-ক্ষেত্রে তার যথোচিত সদ্ব্যবহার করেননি। মানুষকে ধর্ম-পরিচয়ে চিহ্নিত করেননি, সেই বাইশ বছর বয়সেও।

তরুণ বয়সে লিখিত 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য বিশেষ না - থাকলেও এর সম্প্রীতি মূল্য কম নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুবিস্তৃত সাহিত্য-জীবনে কোনও সীমায়নে বাঁধা পড়েনি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রতিভা ও খ্যাতির মধ্য - গগনে, তখন তিনি লিখেছেন 'আনন্দমঠ'। ১২৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শুরু হয়ে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত 'আনন্দমঠ', 'বঙ্গদর্শন,' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময় সীমায়, ১২৮৮ সালের কার্তিক থেকে ১২৮৯ সালের আশ্বিন পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট'। লক্ষণীয়, পরিণত বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'আনন্দমঠ' -এ উগ্র হিন্দুয়ানি প্রবর্তনায় রত, তখন তরুণ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন হিন্দু - চরিত্রের প্রবল রাজ্যলিপ্সার নিষ্ঠুর পরিচয়। এখানেই অন্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তফাৎ।

'বউ-ঠাকুরানীর হাট' রচনার পর তিনি লিখলেন 'রাজর্ষি' (১২৯৩)। এই উপন্যাসে কয়েকটি অপ্রধান মুসলমান - চরিত্র রয়েছে। তাদের ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এখানে হিন্দুঃধর্মের জিঘাংসার দিকটি সুস্পষ্ট করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ধর্মের উগ্রতা ব্যক্তি বা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এ ছিল তাঁর কাছে প্রবল বেদনার বিষয়। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে তাঁর সেই মনোবেদনাই ফুটে উঠেছে জয়সিংহের আত্মনিবেদন আর রঘুপতির নৃশংসতার পরিচয়ে।

ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দমাণিক্য ধর্মপ্রবণ হলেও ছিলেন মন্দিরে বলিদানের প্রবল বিরোধী। বিপরীতে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি চান দেবীকে নরবলিতে খুশি করতে। দুই চরিত্রের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব, তৈরি হয়। রঘুপতি জয়সিংহকে ধর্মের নামে রাজরক্ত আনতে

আদেশ করেন। শেষ পর্যন্ত রঘুপতির সন্তানপ্রতিম শিষ্য জয়সিংহ আত্মবলিদানে দেবীকে তুষ্ট করেন। বেদনায়, হতাশায়, শোকে ভেঙে পড়েন রঘুপতি। ধর্মের জিঘাংসা এই ট্রাজিক পরিণতিতে পৌঁছয় উপন্যাসের শেষাংশ। রঘুপতির ব্রাহ্মণ্য সংস্কার তছনছ হয়ে যায়। প্রথা ও সংস্কারের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে মানবিক মুল্যবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, যা তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলির সারাংশ।

মুঘল শাসিত ত্রিপুরার পটভূমিতে রাজর্ষি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে, এখানে মুসলমান- চরিত্র এসেছে স্বাভাবিক নিয়মেই। রবীন্দ্রনাথ খুব স্বল্প পরিসরে, ইঙ্গিতে প্রকৃত ধর্মের বিরোধী হিন্দু - মুসলমান দুই ধর্ম-ব্যবসায়ীর স্বরূপ পরিস্ফূট করেছেন ঘটনা ও সংলাপের প্রেক্ষিতে — কোনও স্থূল মন্তব্য ছাড়াই।

উপন্যাসে শাহ সুজা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও রবীন্দ্রনাথের কলমে এই চরিত্রটির মৌলিক পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এখানে ইতিহাসের ঘনঘটা একটা নিমিত্ত মাত্র, রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাধিকারি গোবিন্দমাণিক্য ও আওরঙ্গজেব ভ্রাতা শাহ সুজার কাহিনি একত্রিত করে একটি চিরন্তন সত্য আবিষ্কারে তৎপর। রঘুপতির ভাষায়, 'হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি (গোবিন্দমাণিক্য) যে পথ অবলম্বন করিয়াছ (সন্ন্যাস গ্রহণ), তাহাতেই সুখ।' সে পথ সর্বত্যাগীর পথ, মানবসেবার পথ, মানুষে মানুষে সেতুবন্ধনের পথ।

উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশ প্রায় সম্পূর্ণ সত্য। ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দমাণিক্য ধর্মানুষ্ঠান পশুবলি বন্ধ করে দিলে প্রজাবর্গ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। এই সুযোগে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র রায় রাজ্যের লোভে পুরোহিতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। ফলে রাজ্যমধ্যে ধর্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। বঙ্গদেশের তদানীন্তন সুবাদার সুজার সাহায্যে গোবিন্দমাণিক্যকে উৎখাত করে নক্ষত্র রায় সিংহাসন অধিকার করেন। পরে সুজা আওরঙ্গজেবের ভয়ে পলায়িত অবস্থায় গোবিন্দমাণিক্যের কাছে লজ্জিতভাবে আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন।

এইভাবে গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে শাহ সুজার ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনি জড়িত হয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে এই কাহিনি গোবিন্দমাণিক্যের কাহিনির সঙ্গে শিথিলভাবে প্রযুক্ত হলেও এর একটি স্বতন্ত্র অর্থব্যঞ্জনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সুজার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের সাদৃশ্য দেখাবার জন্য মুঘল দরবারের ভ্রাতৃ বিরোধকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রান্তীয় ত্রিপুরা রাজ্যের সাদৃশ্য এইখানে, গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্র রায় কর্তৃক বিতাড়িত। সুজাও আরঙ্গজেব কর্তৃক বিতাড়িত। দুজনের বেদনার উৎস অভিন্ন। কাহিনির পরিসমাপ্তিতে গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'আর সব হইল, কেবল নক্ষত্র আমাকে ভাই বলিল না।' সুজা তীব্রভাবে বললেন, 'মহারাজা, আর সকেলই অতি সহজেই ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে, কেবল নিজের ভাই করে না।'

রঘুপতি নির্বাসনের পর থেকে 'রাজর্ষি'-র কাহিনি ঐতিহাসিক রোমান্সের রীতিতে বিন্যস্ত। উপন্যাসের এই অংশে শাহ সুজা ও মুঘলদের ভ্রাতৃকলহের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। লেখক মুঘল শাসনের এই পর্বটিকে জীবন্তভাবে চিত্রিত করে ঐতিহাসিক রসসৃষ্টির নৈপুণ্য দেখিয়াছেন। এই অংশটি স্টুয়ার্ট-কৃত 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' অবলম্বনে রচিত।

'তখন মোঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল। তখন তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরংজীব দক্ষিণাপথে বিজাপুর আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাংলার অধিপতি ছিলেন, রাজমহলে তাঁহার রাজধানী। কনিষ্ঠ পুত্র কুমার মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্তা। জ্যেষ্ঠ যুবরাজ দারা রাজধানী দিল্লীতেই বাস করিতেছেন। সম্রাটের বয়স ৬৭ বৎসর। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া দারার উপরেই সাম্রাজ্যের ভার পড়িয়াছে।'

এই অবস্থায় শাহ সুজা সিংহাসন লোভে দিল্লী যাত্রা করলেন। পথে মুঘল সৈন্যরা যে অত্যাচার করল তার চিত্র হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী : '...পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যেরা যে পথ দিয়া গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে কেবল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে।... অধিকাংশ লোক গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়াছে ...মৃত দেহের উপর শৃগল কুকুরের ন্যায় মাঝে মাঝে সৈন্যদল ও দস্যুদলে লড়াই বাধিয়া যায়। নিষ্ঠুর সৈন্যদের খেলা হইয়াছে, পার্শ্ববর্তী নিরীহ পথিকের পেটে খপ করিয়া একটি তলোয়ারের খোঁচা বসাইয়া দেওয়া বা তাহার মুন্ড হইতে পাগড়ি সমেত খানিকটা খুলি উড়াইয়া দেওয়া তাহারা সামান্য উপহাসমাত্র মনে করে। ...অকারণে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া যায়। বলে যে, বাদশাহের সম্মানার্থ বাজি পুড়াইতেছে। ...(রঘুপতি) রাত্রে অন্ধকার এক ভগ্ন কুটিরে শ্রান্তদেহে শয়ন করিয়াছিলেন, সকালে উঠিয়া দেখেন এক ছিন্নশির মৃদদেহকে সমস্ত রাত্রি বালিশ করিয়া শুইয়া ছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে রঘুপতি ক্ষুধিত হইয়া কোনো কুটিরে গিয়া দেখিলেন, একজন লোক তাহার ভাঙা সিন্দুকের উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে, বোধহয় তাহার লুণ্ঠিত ধনের জন্য শোক করিতেছিল। কাছে গিয়া ঠেলিতেই সে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। মৃতদেহ মাত্র, তাহার জীবন অনেককাল হইল চলিয়া গিয়াছে।'।

রবীন্দ্রনাথ স্টুয়ার্টের বর্ণনাকে নবরূপ দান করেছেন। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সুজাকে রবীন্দ্রনাথ স্টুয়ার্টের রেখাতেই অঙ্কিত করেছেন। সুজা বিলাসী, মদ্যপ ও কিছুটা দায়িত্বজ্ঞানহীন। সিংহাসন দখলের ভ্রাতৃ-সংঘর্ষে তিনি বড়ো বিরক্ত — সংঘর্ষহীন শান্তির পরিবেশই তাঁর কাম্য। 'রাজর্ষির নায়ক গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে তার চারিত্রিক মিল এখানেই। সম্রাট সৈন্যদের হাতে বন্দি শাহ সুজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'ইহারা কী বেয়াদব? শিবির হইতে আমার আলবোলাটা আনিয়া দিবে, তাহা তো ইহাদের মনে উদয় হইল না।

এই বিলাসী আত্মভোলা সুজা পরবর্তীতে ভ্রাতা আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে অন্য মানুষের পরিণত হন। তখন তিনি ছদ্মবেশী ফকির বিশেষ, সঙ্গে বালকের ছদ্মবেশে তিন কন্যা। পরাজয় তাঁর চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কেন সন্ন্যাসি হলেন কন্যার এই প্রশ্নের উত্তর সুজাকে বলতে শুনি, 'হয়তো তাহার সহোদর ভ্রাতা সৈন্য লইয়া তাঁহাকে একটি গ্রাম্য কুকুরের মতো দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়া করিয়াছে। রাজ্য ও সুখ সম্পদ হইতে তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে। এখন হয়তো কেবল দারিদ্রের অন্ধকার, ক্ষুদ্র গহ্বর ও সন্ন্যাসীর গেরুয়াবসন পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার একমাত্র লুকাইবার স্থান। আপনার ভ্রাতার বিদ্বেষ হইতে, আর কোথাও রক্ষা নাই। 'বলা বাহুল্য এ তাঁর আত্মকথা। গোবিন্দমাণিক্যের কথা বলতে গিয়ে সুজা অলক্ষ্যে আপন ট্রাজেডির কথাই ব্যক্ত করেছেন।

অন্যদিকে গোবিন্দমাণিক্যও ফকিরবেশী শাহ সুজার চরিত্রের সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন : 'এ কেবল আপনার বাসনা তৃপ্ত হয় নাই বলিয়া রাগ করিয়া সমস্ত জগতের প্রতি বিমুখ হইয়া বাহির হইয়াছে। তিনি (সুজা) যাহা চান তাহাই তাঁহার পাওনা এইরূপ ফকিরের (সুজা) বিশ্বাস,

এবং জগৎ তাঁহার নিকটে যাহা চায় তাহা সুবিধামতো দিলেই চলিবে এবং না দিলেও কোনো ক্ষতি নাই। ঠিক এই বিশ্বাস - অনুসারে কাজ হয় নাই বলিয়া তিনি জগৎকে একঘরে করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।' ট্রাজেডির ভিন্ন উৎসমুখ যখন একই মোহনায় এসে মেশে তখন এমনি করেই পরস্পরের মন জানাজানি হয়। তারা দুই বিতাড়িত রাজা পরস্পরের বেদনাকে এতটা নিবিড় করে অনুভব করতে পেরেছিলেন।

উপন্যাসের দ্বিতীয় মুসলিম চরিত্র আওরঙ্গজেবের পুত্র কুমার মহম্মদ। পিতার হুকুমে তিনি পিতৃব্য সুজার পশ্চাৎ ধাবমান। অথচ সুজা-কন্যা তাঁর বাগদত্ত—যুদ্ধের ডামাডোলে কুমার মহম্মদ তা বিস্মৃত হয়েছেন। সুজা-কন্যা লিখলেন, 'কুমার এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল? যাহোক মনে মনে স্বামীরূপে বরণ করিয়া আমার হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি, যিনি অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তিনি আজ নিষ্ঠুর তরবারি হস্তে আমার পিতার প্রাণ লইতে আসিয়াছেন। এই কি আমাকে দেখিতে হইল। কুমার এই কি আমাদের বিবাহ-উৎসব! তাই কি এত সমারোহে। তাই কি আমাদের রাজমহল আজ রক্তবর্ণ। তাই কি কুমার দিল্লী হইতে লোহার শৃঙ্খল হাতে করিয়া আনিয়াছেন। এই কি প্রেমের শৃঙ্খল।'

এ-পত্র পাঠ করে 'সহসা প্রবলভূমিকম্পে' কুমারের হৃদয়ে 'বিদীর্ণ' হয়ে গেল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, তৎক্ষণাৎ সাম্রাজ্যের আশা, বাদশাহের অনুগ্রহ সব তুচ্ছজ্ঞান করে ছুটে গেলেন আরাধ্য রমণীর কাছে, ওদের বিয়ে হয়ে গেল। আওরঙ্গজেব মর্মাহত হলেন। এবার তিনি কৌশলে মহম্মদকে স্বপক্ষে আনবার প্রচেষ্টা নিলেন। সুজার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেবার জন্য পুত্র মহম্মদকে লিখলেন: 'প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ, তুমি তোমার কর্তব্য অবহেলা করিয়া পিতৃবিদ্রোহী হইয়াছ, এবং তোমার অকলঙ্ক যশে কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছ। রমনীর ছলনায় হাস্যে মুগ্ধ হইয়া আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়াছ। ভবিষ্যতে সমস্ত মোগল-সাম্রাজ্য শাসনের ভার যাঁহার হস্তে, তিনি আজ এক রমনীর দাস হইয়া আছেন।' এরপর আওরঙ্গজেব যা লিখলেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুটনীতির চালে আওরঙ্গজেব কেমন পারদর্শী ছিলেন চিঠির অবশিষ্টাংশে তার চমৎকার উদাহরণ মেলে। তিনি মিথ্যা করেই লিখলেন : 'যাহা হইক, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া মহম্মদ যখন অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে মাপ করিলাম। কিন্তু যে কার্যের জন্য গিয়াছেন সেই কার্য সাধন করিয়া আসিলে তবে তিনি আমাদের অনুগ্রহের অধিকারী হইবেন।'

আওরাঙ্গজেবের পত্রবাহক কৌশলে এ-চিঠি সুজার কাছে পৌঁছে দিল এবং তা পাঠ করে সুজা 'বজ্রাহত' হলেন। তবে কি গোপনে মহম্মদ আওরাঙ্গজেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সুজার মনে সন্দেহ জন্মে। অবশেষে অরাঙ্গজেবের কুট চালেরই জয় হয়, সুজার মনে সন্দেহ তীব্রতর হয়। তিনি মহম্মদকে ডেকে বললেন, 'বৎস, আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি, তুমি তোমার স্ত্রীকে হইয়া প্রস্থান করো, নহিলে আমাদের মনে আর শান্তি থাকিবে না। আমার রাজকোষের দ্বারা মুক্ত করিয়া দিলাম, শ্বশুরের উপহারস্বরূপ যত ইচ্ছা ধন রত্ন হইয়া যাও।' তারপর স্ত্রীসহ সাশ্রুনয়ন মহম্মদ সুজার শিবির ত্যাগ করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন। উপন্যাসের মহম্মদ প্রসঙ্গটি স্টুয়ার্টের ইতিহাসের অনুরূপ।

উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি দুই বিপরীত শক্তি বা ধর্মের প্রতীক। 'রাজা হইয়া ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিয়া, লোক - হিতার্থ ধনজনমান মুহূর্তেই বিসর্জন করিবার শক্তি রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ছিল বলিয়া তিনি যথার্থই রাজর্ষি। কিন্তু রঘুপতি সর্বত্যাগী হইয়াও সংস্কারবদ্ধ, সংস্কারকেই সে ধর্ম বলিয়া জানে। বিশুদ্ধ প্রেমের ধর্ম হইতে এই বুদ্ধিহীন হিংসাধর্মকে রবীন্দ্রনাথ পৃথক করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২) উপন্যাসের শুরুতেই দেখি, গোবিন্দমাণিক্য অন্তরের নির্দেশে প্রেমের অহিংস পুজার আদর্শকে বরণ করেছেন।

গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রের বিবর্তনে এবং রবীন্দ্রনাথের মহান মানবধর্ম প্রচারে 'রাজর্ষি'-র বিল্বন চরিত্রটি যথেষ্ট সহায়তা করেছে। যদিও উপন্যাসের শেষাংশে তাঁর অবতারণা, কিন্তু এই চরিত্রটির মধ্যে মহৎ সম্ভাবনায় বীজ রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 'বিল্বন হইতেছেন কর্ম সাধকের মূর্তি, তিনি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়াও তাহার উর্ধ্বে বাস করেন। সবকিছু তিনি স্পর্শ করেন, কিন্তু কোনো কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শারদোৎসবের রাজা, রাজার ঠাকুর্দা, অচলায়তনের গুরু, এমন কি 'চতুরঙ্গের' জ্যাঠামশাই প্রভৃতি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের এই তেইশ বৎসর বয়সের সৃষ্টি বিল্বনের রূপান্তর বলিলে দুঃসাহসিকতা হইবে না।' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পুর্বোপ্ত পৃ.৩ ২২৩)

বিল্বন চরিত্রে মহত্তম মানসিক আদর্শের সমাবেশ ঘটেছে। বিল্বন উপবীতধারী ত্যাগী, বলিপ্রথা বিরোধী, ধর্মযুদ্ধের সৈন্য সংগ্রহে তাঁর উৎসাহের কোনও অভাব দেখা যায় না। মুঘল সৈন্যের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার মধ্যে তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। বিল্বন চরিত্রে যা আমাদের সর্বাধিক আকৃষ্ট করে তা বিল্বনের অসাম্প্রদায়িক মানবিক উদারতা। মুসলমান পাড়ার মড়কে ঠাকুর বিল্বন সব সংস্কার তুচ্ছ জ্ঞান করে সেবা কার্যে এগিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পাঠানদের পাড়ায় মড়কের প্রথম আরম্ভ হইল। মৃতদেহের গোর দিবার বা পরস্পরকে সেবা করিবার অবসর কাহারও রহিল না। হিন্দুরা কহিল, মুসলমানেরা গো হত্যা পাপের ফলে ভোগ করিতেছে। জাতিবৈরিতায় এবং জাতিচ্যুতি ভয়ে কোনো হিন্দু তাহাদিগকে জল দিল না বা কোনোপ্রকার সাহায্য করিল না। বিল্বন সন্ন্যাসী যখন গ্রামে আসিল তখন গ্রামের এইরূপ অবস্থা। বিল্বনের কতকগুলি চেলা জুটিয়াছিল, মড়কের ভয়ে তাহারা পালাইবার চেষ্টা করিল। বিল্বন ভয় দেখাইয়া ত্যহাদিগকে বিরত করিলেন। তিনি পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন— তাহাদিগকে পথ্য স্থানীয় ঔষধ এবং তাহাদের মৃতদেহ গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা হিন্দু সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।' হিন্দুরা এই কার্যে বাধা দিলে বিল্বন তা অগ্রাহ্য করেন। তাঁর বক্তব্য : 'আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত। ভগবানের সৃষ্টি মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে, তখনই বা কিসের জাত।' যে বিল্বন মুসলমানদের হাত থেকে দেশরক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে বিল্বনকেই দেখা গেল মড়কের সময়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পীড়িতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এ-কারণে 'মুমূর্ষু' পাঠানেরা তাঁহাকে (বিল্বন) দেবতা জ্ঞান করিতে লাগিল।' এখানে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ঔদার্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'হিন্দুরা বিল্বনের অনাসক্ত পরহিতৈষণা দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে যেন সাহস করিল না। বিল্বনের কাজ

ভালো কি মন্দ তাহারা স্থির করিতে পারিল না। তাহাদের অসম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'ভালো নাহে', কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভেতরে যে মনুষ্য বাস করিতেছে সে বলিল, 'ভালো'। এই মন্তব্যে মানবপ্রেমিক রবীন্দ্র-মানসের প্রকৃত স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

আমাদের উনিশ ও বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির কবলে পড়ে বারবার দিশাহারা হয়েছে। আমাদের কাব্য, নাটক - উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে বিশেষত মুসলমানকে হিন্দুরা স্বাধীনতা ধ্বংসকারী হিসাবে চিত্রিত করার ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে যথা পরিমাণে সচেনতার পরিচয় দিতে পারেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের বিম্বন কর্তৃক প্রচারিত এবং আচরিত আদর্শবাদ রাজনৈতিক সচেতনতার উন্নত পর্যায়ের দিক নির্দেশ করে।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ রুশ সমাজ ও রাষ্ট্রের অভূতপূর্ব রূপান্তরে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং সে অনুযায়ী শিক্ষা ও সমবায়ের মাধ্যমে দেশী সমাজের রূপান্তর চেয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগও নিয়েছেন। কিন্তু যে বিপ্লবী পন্থায় সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে তা তাঁর কাম্য ছিল না। কেননা মার্কসবাদে নির্দিষ্ট শ্রেণীসংগ্রামের পথটি রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট মানবিক মনে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সমাজের পরিবর্তন চেয়েছেন, রাষ্ট্রেরও। কিন্তু এজন্য চলমান রাজনীতিকে অনুকূল মনে করেননি। বরং অনেক ক্ষেত্রে চলমান রাজনীতির কোনো কোনো দিক তার কাছে রাষ্ট্র ও সমাজস্বার্থের বৈরী বলেই মনে হয়েছে।

তাঁর মতে, সাম্রাজ্যবাদের মূল হচ্ছে দুর্দমনীয় লোভ। এই লোভের নিবৃত্তি দরকার। তিনি মঙ্গলময় ভারতীয় সমাজের কামনা করেছেন। এই মঙ্গলময় সমাজ গঠনের জন্য আত্মত্যাগ ও আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন। তিনি জাতীয় ঐক্য, ব্যাপক গণসংযোগ ও শিক্ষা সংস্কারমূলক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন।

গঠনমূলক স্বাদেশিকতা তাঁর কাম্য ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ দরখাস্ত-সর্বস্ব রাজনীতি ও আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি ধর্মে সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ তথা হিন্দুত্বের উর্ধ্বে ওঠার ওপর জোর দেন। জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ভারতাত্মার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, উগ্র জাতীয়তাবোধ ও সাম্প্রদায়িকতা দুই-ই ভারতাত্মার মুক্তিসাধনার পরিপন্থী। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকাকেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন।

'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসের গোরা তাঁর এই মতাদর্শের সার্থক প্রতিনিধি। গোরার উগ্র স্বদেশিকতা একসময় একেবারেই উবে যায় এবং সে জাতি-ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে মানবতাবাদে দীক্ষাগ্রহণ করে ও ভারতাত্মার মুক্তিসাধনায় ব্রতী হয়। গোরা অপেক্ষা নিষ্প্রভ হলেও 'ঘরে বাইরে' উপনাসের নিখিলেশ রবীন্দ্রনাথের এই মতাদর্শেরই পথিক। উপন্যাস 'চার অধ্যায়" অতীনেরও বিভ্রান্তি কাটাতে গিয়ে বিলম্ব ঘটেনি।

'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তার মোটাদাগের প্রতিফলন আছে। উপন্যাসগুলোতে রাজনীতি মুখ্য বিষয় হিসাবে রূপলাভ করেছে। উপন্যাসত্রয়ের মধ্যে 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের দেশ - কাল - সমাজ ভাবনার মহাকাব্যিক গদ্যভাষা। তাই রবীন্দ্রনানসে আবর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তার স্বরূপ এখানে অনেকটা স্পষ্টরূপেই প্রতিভাত।

হিন্দুমেলার সময়কাল থেকে রবীন্দ্রনাথের মনে রাজনৈতিক ভাবনা দানা বাঁধতে থাকে। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি লক্ষ্য করতে থাকেন রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি। অন্যদের মতো তিনি কখনো বৈদেশিক আক্রমণকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে উল্লেখ করেননি। তিনি দেখিয়েছেন যুগে যুগে সমন্বয় এবং সামঞ্জস্যের ব্যাপারকে। ১৮৮৪ সালের ২৭ জানুয়ারি ইলবার্ট বিল পাশ হবার পর দেখা যায় ইংরেজ বণিক ও কর্মচারীর স্বার্থ এতে নির্লজ্জভাবে রক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এটা সহ্য করতে পারেননি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালত অবমাননার দায়ে জেলের ব্যাপারটিও রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিয়েছিল। এই সময় থেকেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা স্পষ্ট করে দিতে থাকেন। ১৮৯১ সাল থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে তিনি এ ধরনের ছাপ্পান্নটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এ প্রবন্ধগুলি তাঁর 'আত্মশক্তি,' 'রাজা প্রজা', 'ভারতবর্ষ', 'সমুহ ও স্বদেশ', প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে 'গোরা' রচিত হয়েছে এই পর্যায়ে, ভারতবর্ষের স্বরূপ সন্ধান এ সময়কার আরো বহু রচনার মতো এরও উপজীব্য।

স্বদেশপ্রেমের ভন্ডামি রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। তিনি তীব্র ভাষায় তার বিরোধিতা করেছেন। গোরা সেই মূর্তিমান বিরোধ। তার চরিত্রে স্বদেশী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের (১৮৬১-১৯০৭) ছায়া পড়েছে। প্রবল আবেগ এবং গভীর উপলব্ধির বশে তিনি পরপর নানা ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনুভব করেছেন, গোরা চরিত্রেও যা লক্ষ্য করা যায়। কলেজে পড়ার সময় কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর 'নববিধান' ব্রহ্মসমাজের আদর্শে দীক্ষিত হন। কিছুদিন পরে তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রাদি অনুশীলন শুরু করেন। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গেও পরিচিত হন। ইতোপূর্বে গভীর হিন্দুধর্মীপ্রেমী থেকে হয়ে ওঠেন হিন্দুধর্মদ্বেষী। বিশেষ করে বেদান্তের তীব্র সমালোচনা শুরু করেন তিনি এবং ব্যবহারে এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি হয়ে ওঠেন আচারের ব্যবহারে বেশভূষায় আদর্শ হিন্দু কিন্তু নিষ্ঠার দিক থেকে খ্রিস্টান। ১৯০১ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে প্রাচীন আর্যকুলের রীতি অনুযায়ী এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সময়েই একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এই পরিচয়ের সূত্রে তাঁর জীবনের নানা তরঙ্গ উঠে এসেছে গোরার চরিত্রে।

উনিশ শতকের শেষদিকে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের কাল নয়, ধর্মান্দোলনেরও কাল। 'গোরা" উপনাসকে যে মহাকাব্য - তুল্য উপন্যাস বলা হয়ে থাকে তার কারণ এই বিশালভ্যাপ্ত কাল এবং তার বিচিত্র ঘটনা নানাভাবে উপন্যাসে উঠে এসেছে। প্রতিটি ঘটনা এবং অনুভূতি একমুখী নয়। পদ্মার বিচিত্র স্রোতধারার মতো তা রহস্যময়, বৈচিত্র্যময়, বহুমুখী এবং সে কারণেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি চরিত্রের সজীবতা 'গোরা' উপন্যাসে এনেছে সম্পূর্ণ অনুভূতির স্বাদ। উপন্যাসটিতে যে সময়ের মর্মকথাটি ধরা পড়েছে তা ১৮৮০ সাল ও তার সামান্য আগে পরের সময়ের। হিন্দুধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী ভাবধারার সঙ্গে জড়িত উগ্র জাতীয়তাবাদ, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিপত্তি ও হিন্দু সমাজের বিরোধ, হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ও নবীনে-প্রবীণে দ্বন্দ্ব, শিক্ষাপ্রাপ্তদের শাসক তোষণ, উগ্র জাতীয়তাবাদীদের ব্রিটিশ বিরোধিতা,

কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ইত্যাদি এ সময়ের চিহ্নায়ক।

উপন্যাসের গোরার জাতীয়তাবাদ উগ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। গোরা উগ্র স্বজাতি (হিন্দু) প্রেমিক ও অন্ধ দেশ (ভারত) প্রেমিক। তার হিন্দুত্ব, ও ভারতীয়ত্ব অভিন্ন। গোরা বলেছে, 'একটি সত্য ভারতবর্ষ আগে-পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেইখানে স্থিতি না হলে আমরা কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণরসটা টেনে নিতে পারব না। তাই বলছি, আর সমস্ত ভুলে, কেতাবের বিদ্যে, খেতাবের মায়া, উঞ্ছবৃত্তি প্রলোভন, সব টান মেরে ফেলে দিয়ে সেই বন্দরের দিকেই জাহাজ ভাসাতে হবে ডুবি তো ডুবব, মরি তো মরব। সাথে আমি ভারতবর্ষের সত্য মূর্তি, পূর্ণ মূর্তি কোনোদিন ভুলতে পারি নে।'

গোরার প্রত্যয় এই যে, যে যে দেশে জন্মেছে সে দেশের আচার বিশ্বাস ও শাস্ত্র ও সমাজের জন্য মোটেই সংকুচিত হবে না। দেশের সবকিছুকেই সগর্বে মাথায় তুলে নিয়ে দেশকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবে। গোরার মতো, হিন্দু একটি জাতি ও তা সমুদ্রের মতোই বৃহৎ, এই জাতির জাতিত্ব কোনো সংজ্ঞার দ্বারা সীমাবদ্ধ করে বলা যায় না। তাঁর ভাষায় : 'কেবল হিন্দু ধর্মই জগতে মানুষকে বলেই স্বীকার করেছে, দলের লোক বলে গণ্য করেনি। হিন্দুধর্ম মুঢ়কেই মানে, জ্ঞানীকেও মানে; এবং কেবলমাত্র জ্ঞানের এক মূর্তিকেই মানে না, জ্ঞানের বহু প্রকার বিকাশকে মানে। খ্রিস্টানেরা বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে চায় না, তারা বলে এক পারে খৃষ্টধর্ম আর এক পারে অনন্ত বিনাশ, এর মাঝখানে কোন বিচিত্রতা নেই। আমরা সেই খ্রিস্টানের কাছ থেকে পাঠ নিয়েছি, তাই হিন্দুধর্মের বৈচিত্রের জন্য লজ্জা পাই। এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই হিন্দুধর্ম যে এককে দেখবার জন্যে সাধনা করেছে সেটা আমরা দেখতে পাই নে'।

রবীন্দ্রনাথ সনাতন হিন্দুধর্মকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন এই উপন্যাসে। জন্মসূত্রে হিন্দু না হলে যে হিন্দু হওয়া যায় না— এই সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি 'গোরা' উপন্যাসে। যে-মুহূর্তে গোরা জানতে পারল জন্মসূত্রে সে হিন্দু নয়, তখন তার এতদিনের হিন্দুত্বের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ঠুনকো হিন্দুত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথের আফসোস কম নয়। এই প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় 'রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ' নামক প্রবন্ধে গোরা উপন্যাস রচনার পটভূমিকায় রবীন্দ্র - মানসের যে পরিচয় দিয়েছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত রায় বলেছেন, 'তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) নিজের মনেই একটা খটকা ছিল। ভগিনী নিবেদিতা তাহলে কি? হয়তো তিনি ভারতীয় বা হিন্দু নন, অথচ তাঁকে অহিন্দু বা অভারতীয় বলা যায় না। তাঁকে মেনে নিলে ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব জন্মনির্ভর নয় যে কেউ হিন্দু হতে পারে। কিন্তু তা হওয়া কি এত সোজা! কেউ কি খুলে দেবে। হিন্দুদের মন্দিরের দ্বার তেমনি হিন্দুর জন্যে? ভারতীয়দের সমস্ত অধিকার তেমন ভারতীয়ের জন্যে?'

এইসব প্রশ্নজালে জর্জরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ একজন হিন্দুর দৃষ্টিকোণ থেকে পার্শ্ববর্তী মুসলমান সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেন। মুসলমান সমাজের সাম্যবাদ, সংহতি ও বর্ণবৈষম্যহীনতা তাঁকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদয়ালের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'হিন্দু বললেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান হওয়া সোজা, খ্রিস্টান যে-সে হতে পারে কিন্তু হিন্দু! ও বড়ো শক্ত কথা।' এই প্রসঙ্গটি পরেও আলোচিত হয়েছে। পরেশবাবু বলেছেন, 'হিন্দু সমাজে প্রবেশের কোনো পথ নেই। অন্তত সদর রাস্তা নেই। খিড়কির দরজা থাকতেও পারে। এ সমাজ সমস্ত মানুষের নয়-দৈববেশ যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে এ সমাজ কেবল মাত্র তাদের।' সুচরিতা বলে, 'সব সমাজই তো তাই।' তখন পরেশবাবু উত্তর দেন, 'না কোনো বড়ো সমাজই তা নয়। মুসলমান সমাজের সিংহদ্বার সমস্ত মানুষের জন্য উদ্‌ঘাটিত। সেই জন্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে। এরকমভাবে চললে ক্রমে এ-দেশে মুসলমান প্রধান হয়ে উঠবে, তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে।'

কৃষ্ণদয়াল হিন্দুত্বের বড়াই করলে আনন্দময়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন, 'তোমরাই যদি এত উচুঁ জাত আর ভগবানের এত আদরের তবে তিনি একবার পাঠানের, একবার মোগলের, একবার খ্রীষ্টানের পায়ে এমন করে তোমাদের মাথা মুড়িয়ে দিচ্ছেন কেন?' কৃষ্ণদয়াল এর কোন সদুত্তর খুঁজে পান না। অথচ এই রক্ষণশীল কৃষ্ণদয়াল একদিন তরুণ বয়সে বিদ্রোহী ছিলেন। এর প্রমাণস্বরূপ পরেশবাবু গোরাকে বলেন, 'তখনকার দিনে কলেজে আমরা দুজনেই (কৃষ্ণদয়াল ও পরেশবাবু) এক জুড়ি ছিলুম-দুজনেই মস্ত কালাপাহাড় —কিছুই মানতুম না, হোটেলে খাওয়াটাই একটা কর্তব্য বলে মনে করতুম। দুজনে কতদিন সন্ধ্যার সময় গোলদিঘিতে বসে মুসলমান দোকানের কাবাব খেয়ে তার পরে কী রকম করে আমরা হিন্দুসমাজের সংস্কার করব রাতদুপুর পর্যন্ত তারই আলোচনা করতুম।'

বিনয় 'গোরা' উপন্যাসের দ্বিতীয় নায়ক। কিন্তু রক্ষণশীলতা তার স্বভাবেও স্পষ্ট। সে 'মুসলমানের তৈরি পাউরুটি-বিস্কুট খাওয়া অনেক দিন ছাড়িয়ে দিয়াছে।' অতএব পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত যুব সমাজের প্রগতি বুলি যে কত অসার, কিভাবে তাদের অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরে আছে, প্রতিটি পদক্ষেপে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেমন করে পথ আগলে বসে আছে, বিনয় চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন।

অন্যদিকে সংকীর্ণতা থেকে উদাররতার সাধনাই গোরার সাধনা। আপন হিন্দু রক্ষণশীলতা, অস্পৃশ্যতা সে ভাঙতে চেয়েছে। গোরার রোজ রোজ সকালবেলায় একটা নিয়মিত কাজ ছিল, পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকের ঘরে যাতায়াত করা। 'তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবার জন্য নহে নিতান্তই তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্যই যাইত।' তারা গোরাকে বলতো দাদাঠাকুর, তাদের কড়ি বাঁধা হুঁকোয় তামাক খেতে দিয়ে অভ্যর্থনা করতো। গোরা তাই তাদের সঙ্গে মেশার সুযোগ বজায় রাখার জন্যই তামাক খাওয়া শুরু করে। আলাদা হুঁকোয় তামাক খেতে দেওয়া গ্রামবাংলার সনাতন আপ্যায়ন রীতি, সেখানে জাতের বিচার করা হয় না। আর কড়িবাঁধা হুঁকো অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গোরা তাদের পাড়ায় যায় বলেই সেটা দাদাঠাকুরের হুঁকো হিসেবেই আলাদা রাখা হতো শুধু তারই ব্যবহারের জন্যে। তবু এইটুকু স্পষ্ট, নিম্নবর্গের সংস্রব একেবারে বাতিল করে উচ্চবর্ণের শুদ্ধাচার আঁকড়ে থাকার মতো সংস্কার গোরা প্রশ্রয় দেয়নি।

কিন্তু গোরার সংস্পর্শে এসে যে বিশ্বাস, মানসিকতা ও চেতনার দিক থেকে তারা সামান্যতম বদলায়নি, দাদাঠাকুর হিসেবে তাকে সম্মান দিয়েছে, শ্রদ্ধা করেছে কিন্তু চরম বিপদেও আপনজন বলে মনে করেনি তার প্রমাণ ছুতার বাড়ির বাইশ বছরের যুবক, গোরার একান্ত ভক্ত নন্দ

মারাত্মক ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হলেও, নন্দ তার বাবা-মাকে অনুরোধ করলেও তারা গোরাকে খবর দেয়নি। ডেকে এনেছে ওঝাকে ঝাড়ফুঁক করে রোগ সাবাবার জন্যে। সেকালে এটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই স্বাভাবিক ঘটনার অভিঘাত গোরার অহংবোধের ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য দরকার ছিল। যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব যে কোথায় শুরু করতে হবে, গোরার চেতনাকে সেই দিকে প্রসারিত করার জন্যেই তরতাজা যুবক নন্দের প্রাণ বলিদান প্রয়োজন ছিল।

নন্দর মৃত্যু যদি গোরাকে বর্ণ সমাজের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে একটা পদক্ষেপ হয়, তাহলে ঔপনিবেশিক ভারতের বৃহত্তম সামাজিক বাস্তবতার চিত্রটি তুলে ধরতে দরকার ছিল আরেকটা ভিন্ন মাত্রার অভিজ্ঞতা। সেই ঘটনা ঘটে যায় নন্দর বাড়ি থেকে ফেরার পথেই। এক বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় ঝুড়িতে ডিম, রুটি নিয়ে কোনো সাহেববাড়ি বা হোটেলে যোগান দিতে যাওয়ার পথেই মস্ত জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়া বাবুর গাড়ির সামনে এসে পড়ে। কেন সে সরে যায়নি সে অপরাধে বাবুটি হাতের চাবুক কষিয়ে দেয় সেই বৃদ্ধের মুখের উপরে। বৃদ্ধ আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু জুড়ি গাড়ি চলে যায় সদর্পে। গোরা সেই বৃদ্ধকে সাহায্য করে পথ থেকে ছিটিয়ে থাকা তার পসরা তুলে দিতে। 'মুসলমান মুটে ভদ্রলোক পথিকের এই ব্যবহারে অত্যন্ত সংকুচিত' হয়। গোরা পুরো দাম দিয়ে সব জিনিসগুলো কিনে নিতে চায়। বলে, 'কিন্তু বাবা, একটা কথা তোমাকে বলি, তুমি কথাটা না বলে যে অপমান সহ্য করলে আল্লা তোমাকে এজন্য মাপ করবেন না।' মুসলমান মুটে উত্তর দেয়, 'যে দোষী আল্লা তাকেই শাস্তি দেবেন, আমাকে কেন দেবেন?' গোরা বলে, 'যে অন্যায় সহ্য করে সেও দোষী, কেননা সে জগতের অন্যায়ের সৃষ্টি করে। আমার কথা বুঝবে না, তবু মনে রেখো, ভালোমানুষি ধর্ম নয়, তাতে দুষ্ট মানুষকে বাড়িয়ে তোলে। তোমাদের মহম্মদ সে কথা বুঝতেন, তাই তিনি ভালোমানুষ সেজে ধর্ম প্রচার করেননি।'

গোরা এই কথা একনিষ্ঠ হিন্দুবাদীর কথা নয়। এটা মানুষের সহজাত মানবিকতার কথা। গোরার সংবেদনশীল মন নিশ্চয়ই নন্দ'র আকস্মিক মৃত্যু আর এই বৃদ্ধ মুসলমানের নিগ্রহ, এই দুয়ের মধ্যে কোথাও একটা অস্পষ্ট যোগসুত্রের ধারণা অস্পষ্টভাবে হলেও খুঁজে পেয়েছিল। দুজনেই সামাজিক অসহায়তার শিকার, একজন কুসংস্কারের, আরেকজন ধর্মীয় বিশ্বাসের। একজন প্রতিকারহীন অসহায়তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, আরেকজন প্রতিকার সে করতে না পারলেও আল্লা করলেন সেই বিশ্বাসে সান্ত্বনা পেতে চায়। সামাজিক বাস্তবতার এই নিষ্ঠুর রূপটি গোরা সেদিন স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অনুভব করেছিল। দুটি ঘটনাই ছিল দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার। নন্দ'র ক্ষেত্রে কুসংস্কারের সামাজিক প্রাবল্য এক নিদারুণ মূঢ়তা, নন্দকে গোরার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ায় গোরার নিজের বিশ্বাসের শক্তিহীনতা; আর বৃদ্ধ মুসলমানের ক্ষেত্রে অসম সমাজে ধর্ম নির্বিশেষে সব নিম্নবর্গের জীবনে বিত্তবানের প্রাবল্য, এক মুহূর্তে সব সামাজিক ধর্মীয় ভেদ মুছে দেয়।

এখানে উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে 'গোরা' রচনা শুরু করেন। এ-সময় (১৯০৫-১৯১১) দেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলেছে। এই আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানের নীরবতা রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করে। তারপর তিনি এই আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তৎপর হন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে বাঙালিত্ব আর হিন্দুত্ব কি এক? নতুবা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির (বাঙালির মুসলমান) এক নীরবতার হেতু কি? এই প্রশ্নই তাঁকে আরেকটি বৃহত্তর প্রশ্নের সম্মুখীন করে। ভারতীয়ত্ব আর হিন্দুত্ব কি সমার্থক? এহেন একাধিক জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়ে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। কুষ্টিয়ার বাউল কবি লালনের 'খাঁচার মাঝে অচিন পাখি, কেমনে আসে যায়' গানটি দিয়ে উপন্যাসটির শুরু এ প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে উপন্যাসের ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে শিলাইদহের অভিজ্ঞতাই ছায়া ফেলেছে রবীন্দ্র-মানসে।

'গোরা' উপন্যাসে গোরার রক্ষণশীল হিন্দু থেকে উদার মানবিকতায় উত্তরণের প্রেরণামূলে মুসলিম সমাজের অভিজ্ঞতা ও প্রভাব কাজ করছে বলে মনে করেছেন হুমায়ুন কবির ও বুদ্ধদেব বসু। নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে রবীন্দ্রনাথ মুসলিম সমাজের সাম্যবাদ, সংহতি ও বর্ণবৈষম্যহীনতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেন এবং ওই সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধাশীলতার প্রতিফলন ঘটে 'গোরা' উপন্যাসের মুসলিম জীবনচিত্রণে ও মুসলিম সমাজ নিয়ে পরেশবাবু-সুচরিতা ও আনন্দময়ী - কৃষ্ণদয়াল সংলাপে। রবীন্দ্রনাথ গ্রামসমাজে গরিব হিন্দু-মুসলমানের ধর্মবিদ্বেষমূলক প্রীতির সম্পর্ক অবলোকন করেন।

পল্লীজীবনে রবীন্দ্রনাথের তিনটি আলাদা অভিজ্ঞতা হয়। প্রথমে ঘোষপাড়া পরে চরঘোষপুর, এবং সর্বশেষে নামহীন এক পল্লী জনপদ, রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে গোরার মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তারই এক তুলনামূলক আলোচনা আছে। ঘোষপাড়া মূলত এক হিন্দুগ্রাম যেখানে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মানুষ বাস করে। চরঘোষপুর একান্তভাবেই মুসলমান বসতি। একঘর হিন্দু নাপিত সেখানে ব্যতিক্রম। আর সর্বশেষে নামহীন জনপদ মূলত হিন্দু নিম্নবর্ণের মানুষদের বাস। সামাজিক মাপকাঠিতে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তারা সবাই নিম্নবর্গ। 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের কথা নানা প্রসঙ্গে বিস্তারিত বললেও মুসলমান উচ্চবর্গের কথা আদৌ বলেননি, বলেছেন গরিব, সাধারণ মুসলমানদের কথা।

গোরা পূর্ববঙ্গের মুসলিম কৃষকদের সংস্পর্শে এসে যে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হয় সেই মন্ত্রই তাকে বৃহত্তর বিশ্ব-মানবতার দ্বারে পৌঁছে দেয়। এদেশের মুসলিমরা গরিব। নিপীড়িত মুসলমানদের চিত্র 'গোরা'-য় ধরা পড়েছে। গোরা গ্রাম দেখতে বেরিয়ে দেখতে পেলেন মুসলিমদের সঠিক চিত্র। এরা শুধু গরিবই নয়, এরা বঞ্চিতও বটে।

গোরা উপন্যাসে একমাত্র মুসলিম চরিত্র চরঘোষপুরের ফরু সর্দার। গ্রামে সাধারণ মানুষের বীর্যবত্তার প্রতীক সে। কিন্তু সে বরাবর উপন্যাসের প্রেক্ষাপটেই রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ফরুর কথা শুরু করেছেন এইভাবে : 'এখানকার প্রজারা সমস্তই মুসলমান এবং ইহাদের প্রধান ফরু সর্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষে দুইবার পুলিশকে ঠেঙাইয়া যে জেল খাটিয়া আসিয়াছে; তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার ঘরে ভাত নাই বলিলেই হয়, কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না। এবারের নদীর কাঁচিচরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরো ধান পাইয়াছিল— আজ মাসখানেক হইল নীলকুটি ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজার ধান লুঠ করে। সেই উৎপাতের

সময় ফরু সর্দার সাহেবের ডান হাতে এমন এক লাঠি বসাইল যে ডাক্তার খানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এত বড়ো দুঃসাহসিক ব্যাপার এ অঞ্চলে আর কখনো হয় নাই। ইহার পর হইতে পুলিশের উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনের মতো লাগিয়াছে— প্রজাদের কাহারো ঘরে কিছু রাখিল না, ঘরের মেয়েদের ইজ্জত আর থাকে না। ফরু সর্দার এবং বিস্তর লোককে হাজতে রাখিয়াছে, গ্রামের বহুতর লোক পলাতক হইয়াছে।'

ফরু সর্দারের পরিবারের অবস্থা : 'ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন, এমন কি তাহার পরনের একখানি মাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছে যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না; তাহার একমাত্র বালকপুত্র তমিজ, নাপিতের স্ত্রীকে গ্রাম সম্পর্কে 'মাসি' বলিয়া ডাকিত, সে খাইতে পায় না দেখিযা নাপিতের স্ত্রী তাহাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে।'

মুসলমানের সন্তান বলে কোনও সংস্কার নাপিত-দম্পতিকে আচ্ছন্ন করেনি। রমাপতি নাপিতের এই অনাকাঙ্খিত কার্যে বিচলিত হয়। গোরা নাপিতকে তার এই অনাচারের' জন্য ভর্ৎসনা করাতে সে উত্তর দেয়, 'ঠাকুর, আমরা বলি হরি, ওরা বলে আল্লা, কোনো তফাৎ নেই।' এই উত্তরে মুহূর্তে গোরার মনে রুদ্ধদুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়। নাপিতের এই কথায় লৌকিক জীবনবোধের যে পরিচয় ফুটে ওঠে তা অনুধাবন করে গোরা নতুন করে আবিষ্কার করে নিজেকে। শ্রেণি বিভক্ত শিক্ষিত সমাজে অস্পৃশ্যতা যতটা ব্যাপক, শ্রেণিহীন খেটে খাওয়া মানুষের সমাজে তা নেই দেখে সে বিস্মিত হয়। শুধু তাই নয়, এই কৃষক সমাজে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায় যে গভীর সম্প্রীতিতে বসবাস করছে, একে অন্যের বিপদে যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তা তাকে মুগ্ধ করে। অন্যদিকে রমাপতির কাছে এই উদারতা, এই মানবতা অসহ্য ঠেকে। নাপিত-বধু তমিজকে কুয়োতলায় নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে দিলে রমাপতির আর সহ্য হয় না, ওই মুহূর্তেই সে গোরার সঙ্গ ত্যাগ করে। গোরার মনেও তুমুল অন্তর্সংঘর্ষ শুরু হয় : 'পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কী ভয়ঙ্কর অধর্ম করিতেছি। উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক (মাধব চাটুজ্জ্যে-নীলকর সাহেবের প্রজাপীড়ক ম্যানেজার) পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে (নাপিত) এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে।'

রবীন্দ্রনাথ তদানীন্তন স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন রমাপতির এই প্রতিক্রিয়াশীল আচরণে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানের নীরবতার একটি কারণ তিনি খুঁজে পান। প্রবল অস্পৃশ্যতাবোধ মুসলমানকে হিন্দুর কাছে ভিড়তে দেয়নি বা হিন্দু মুসলমানকে ঘরের ভিতর তুলতে পারেনি।

শহরের শিক্ষিত সমাজে অন্ধ সামাজিকতার দুর্বিষহ রূপ গোরার চোখে পড়েনি। কারণ সেখানে সাধারণের মঙ্গলের জন্য এক হয়ে দাঁড়াবার শক্তি বাইরে থেকে কাজ করছে। সেই সমাজে একত্রে মিলবার নানান রকম উদ্যোগ দেখা দিচ্ছে। সেখানে তাই গোরার দুশ্চিন্তা ছিল এইসব মিলিত চেষ্টা পাছে আমাদের পরানুকরণ রূপে নিস্ফলতার দিকে না নিয়ে যায়। তাই শহরে শিক্ষিত সমাজে যে গোরা আচারে সামান্যতম শিথিলতাকেও বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না, সেই গোরাই গ্রাম সমাজে এই আচারকে তীব্রভাবে আঘাত করতে উদ্যত হল। গোরা দেখে যে গ্রামের নিচ জাতিদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা অল্প, অনেক পণ দিয়ে তাই বিয়ের জন্য কনে খুঁজতে হয়। পনের দাবি মেটানোর ক্ষমতা না থাকায় অনেক পুরুষকে বাধ্য হয়ে অবিবাহিত থাকতে হয়। এদিকে আবার বিধবা বিবাহ সমাজে কঠিন নিষেধ। তাই ঘরে ঘরে সমাজের স্বাস্থ্য দুষিত হয়ে উঠেছে। গোরা তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে চাইলে তারা জানায় যে, যখন ব্রাহ্মণেরা বিধবা বিবাহ দিতে শুরু করবে তখন তারাও বিষয়টি চিন্তা করবে। তারা মনে করল যে, ছোটো জাত বলে গোরা তাদের অবজ্ঞা করছে, তাই বিধবা বিবাহের মতো হীন আচার যে তাদেরই উপযুক্ত গোরা যেন তাই-ই প্রচার করতে চাইছে।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম কেবল গ্রামের মুসলমান সমাজ। যাকে অবলম্বন করে মানুষকে দাঁড় করানো যায়, মুসলমানদের মধ্যে সেই জিনিসটি আছে। বিপদে মুসলমানেরা যেমন অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে। হিন্দুদের মধ্যে তা লেশমাত্র চোখে পড়ে না। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ হল যে, মুসলিমরা ধর্মের দ্বারা এক হয়েছে, কোনো আচারের দ্বারা নয়। কিন্তু হিন্দুর ক্ষেত্রে ধর্মচেতনার গলা টিপে বিকট হয়ে উঠেছে প্রাণহীন আচারসর্বস্বতা। তাই মুসলিম সমাজের সংহতি ও শক্তির উৎস কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে গোরার অন্তরঙ্গ ভাবনা : 'মুসলমানদের মধ্যে সেই জিনিসটি আছে যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে এক করিয়া দেখিয়াছে গ্রামে কোনো আপদ - বিপদ হইলে মুসলমানেরা যেমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয় হিন্দুরা হয় না। গোরা বার বার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে এই দুই নিকটতম প্রতিবেশী সমাজের মধ্যে এত বড়ো প্রভেদ কেন হইল। যে উত্তরটি তাহার মনে উদিত হয় সে উত্তরটি কিছুতেই তাহার মানিতে ইচ্ছা হয় না। এ কথা স্বীকার করিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নহে। একদিকে যেমন আচারের বন্ধন তাহাদের সমস্ত কর্মকে অনর্থক বাঁধিযা রাখে নাই, অন্যদিকে তেমনি ধর্মের বন্ধন তাহাদের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠ। তাহারা সকলে মিলিয়া এমন একটি জিনিসকে গ্রহণ করিয়াছে যাহা 'না' -মাত্র নহে, যাহা 'হাঁ' যাহা ঋণাত্মক নহে, যাহা ধনাত্মক; যাহার জন্য মানুষ এত আহ্বানে এক মুহূতে একসঙ্গে দাঁড়াইয়া অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে।' হিন্দুদের মধ্যে কেবল ঋণাত্মক উপাদানের বাড়বাড়ন্ত।

এতকাল গোরা কেবল স্বদেশানুরাগের বশে কাজ করেছে, তর্ক করেছে উকিলের মতো, প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য। পল্লীজীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গোরা বোঝে যে, এখানে তার প্রতিপক্ষ নেই, তার যুক্তিতর্কের শ্রোতা নেই। তাই সামাজিক বাস্তবতাকে সে দিনের আলোর মতো দেখতে পায়। কোনো আবরণ ছাড়াই। এই সত্যদৃষ্টি গোরা এর আগে লাভ করার কোনো সুযোগ ও পরিবেশ পায়নি।

উপন্যাসের শেষে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে একটি পরিশিষ্ট অংশ জুড়ে দিয়েছেন। সেখানে দেখি পরেশবাবুর বাড়ির থেকে ফিরে গোরা মা আনন্দময়ীর কাছে গিয়া উপস্থিত হয়েছে। আনন্দময়ীর পদ বন্দনা করে সে বলেছে, 'মা তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে

বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।' এখানেই গোরার ভারত অন্বেষণ প্রয়াসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। উপন্যাসটির বক্তব্য চরম পরিণতিতে এসে সার্থকতা লাভ করেছে। বঙ্গিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্তান দল মায়ের অন্বেষণে ঘর ছেড়ে অরণ্যের অন্ধকারে গিয়ে মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্তি স্থাপন করেছিল। লোকালয়ে জনতার মাঝখানে সহস্র বন্ধনে পীড়িত সংসার জীবনে যে মা তাঁর আহ্বান লিপি সতত প্রেরণ করে চলেছিলেন, তার সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়ে তারা অবশেষে ওয়ারেন হেস্টিংসের ব্রিটিশ শাসনকেই বিধাতার অমোঘ বিধন বলে মেনে নিয়ে আত্ম-উদ্ধারের ইচ্ছায় দুর্গম পর্বত কন্দরে মুখ লুকাতে চেয়েছিল। গোরা সে ভুল করেনি। মাতৃমূর্তির আগে গোরা মাতৃস্বরূপের অন্বেষণে বেরিয়েছিল। সংগ্রামের পূর্বে সংগ্রামের কারণ নির্ণয় করতে পথে নেমেছিল —শহরে-গ্রামে ধনীর অট্টালিকা থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে তাঁকে খুঁজেছিল। অবশেষে আনন্দময়ীর মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয়। সে আপন পথের সন্ধান পেয়েছিল। সেই পথই পথিকের অবলম্বন, সেই পথই তাকে পৌঁছে দেয় তার চরম আকাঙ্খিত মুক্তি -স্বর্গে। তাই গোরার ভারত চেতনা কোনো রোমান্টিক কল্পনায় পৌরাণিক দেবীমূর্তির সন্ধান পায়না। ভারতের মানুষের মধ্যেই গোরা ভারতবর্ষের সন্ধান করতে চেয়েছে।

আসলে ভারত-ইতিহাসের মূল বক্তব্য হল প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। নানা পর্বকে একই লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করা, বহুর মধ্যে এককে নিঃশংসয়রূপে উপলব্ধি করা আর বাইরের প্রতীয়মান পার্থক্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা না করে তার অভ্যন্তরস্থ নিগূঢ় যোগকে সর্বতোভাবে উপলব্ধি করা। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরে তার ভিত্তি নির্মাণ করে এসেছে। পর বলে সে কাউকে দূর করেনি, অনার্য বলে সে কাউকে বহিস্কার করেনি, অসংগঠিত বলে সে কিছুই উপহাস করেনি, সে সমস্তই গ্রহণ করেছে, সমস্তই স্বীকার করেছে। বিচিত্রকে গ্রহণ করে সে তার মধ্যে এক আশ্চর্য শৃঙ্খল স্থাপন করেছে। এই শৃঙ্খল বিধানের সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে মাতৃহৃদয়ের সর্বংসহা কল্যাণময়ী চেতনার। সেই চেতনাকেই গোরা মা আনন্দময়ীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখে তাঁকে মূর্তিমতী ভারতবর্ষ বলে প্রণতি জানিয়েছে। কাজেই বহুযুগের সাধনার ফলে ভারতবর্ষ যেমন এই মূল চেতনাটিকে আবিষ্কার করে তাকে পরম যত্নে লালন-পালন করে এসেছে, মা আনন্দময়ীও তেমনি বহুবিধ প্রচেষ্টার শেষেই এই মাতৃমূর্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছেন। যদিও আনন্দময়ী 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে বিকশিত' অর্থাৎ, একেবার প্রথম থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক আদর্শ চরিত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেননি। অনেক ঝড়জঞ্ঝা অনেক বিরুপ প্রতিকূল অবস্থা পেরিয়েই তিনি সার্থক মাতৃত্বে উপনীত হয়েছিলেন।

মনে হতে পারে গোরার এই ভারতবোধ 'গোরা' রচনার সময়কার কথা নয়, প্রায় পঁচিশ বছর পরেকার স্বদেশিযুগের কথা। বিশেষত, 'গোরা' রচনার সময়কালে (১৯০৭-১০) কিংবা 'গোরা'-র শেষ কিস্তি প্রবাসীতে পাঠিয়ে দেবার দু-তিন মাসের মধ্যে গীতাঞ্জলির বিশেষ কয়েকটি কবিতা ('হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগ রে ধীরে', 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন,' 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' ইত্যাদি বিশেষ ভাবেই স্বদেশিযুগের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু 'গোরা' যে কাল-কে ধরতে চেয়েছে সেই ১৮৭৮-৭৯ সালে এই ভারতবোধ কি ছিল না? গোরার মুখের কথাগুলো কি পরবর্তীকালের ভাবনা? মনে হয় না। সমকালীন ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মান্দোলনের মধ্যে যেন সর্বধর্ম-সমন্বয়ের কথা ছিল বলে তরুণ সমাজ আকৃষ্ট হয়েছিল, তেমনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত হয়ে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন যুক্ত হলেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তরুণ সমাজকে মুগ্ধ করেছিল। বিশেষ করে ১৮৭৮ সালেই—যখন 'গোরা' উপন্যাসের ঘটনা শুরু হচ্ছে তখনই ভারতীয় তরুণ সমাজের সামনে জাতি-ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় ঐক্যবোধের উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক সংকটে হ্যাম্প্ডেন, সিডনি ইত্যাদি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব যেমন এসেছেন, তরুণ ইটালিয়ানদের মনে মাৎসিনি যেমন প্রেরণা দিয়েছেন, আমাদের প্রায় তিনশো বছর আগে শিখগুরু নানক নামক যেমন হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করবার চেষ্টা করেছেন, সেইসব সফল চেষ্টার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর এই সময়কার (১৮৭৮) একটি বক্তৃতার অংশ-বিশেষ তুলে দিচ্ছি: "In the name, then, of a common country, let us all, Hindu, Musalmans, Christians, Parasees, members of the great Indian Community, throw the pall of oblivion over jealousies and dissensions of bygon times, and embrace one another in faternal love and affection, live and work for the benefit of our fatherland." বোধ হয়, সুরেন্দ্রনাথের আগে ভারতীয় ঐক্যের জন্য এমন আবেগপূর্ণ আবেদন আর কেউ করেননি। এবং এই আবেদন যে ভারতবোদের কথা আছে তা অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গোরারও সিদ্ধান্ত। সুরেন্দ্রনাথ এই ভারতবোধকে বাস্তবরূপে দেবার জন্য 'ভারতসবা' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই। এই সভা প্রতিষ্ঠার ৪টি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল হিন্দু মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। কাজেই 'গোরা' উপন্যাসের ঘটনা যখন শুরু হয়েছে তার একটু আগে থেকে ভারতবোধ প্রচার শুরু হয়েছে। এরপর অর্থাৎ ১৮৭৬ সালের পর থেকে 'গোরা' উপন্যাস রচনার আগে পর্যন্ত যে দুজন বিশিষ্ট ভারতীয় এই ভারতবোধ প্রচার করেছিলেন তাঁরা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ('ভারতবাসী আমার ভাই') এবং গোখেল। ১৯০৫ সালে 'সার্ভেন্ট্স্ অব ইন্ডিয়া সোসাইটি'র উদ্বোধনী ভাষনে গোখেল বলেছিলেন, 'The actf that we are Indians first, and Hindus, Mahomedans, Parsees or Christians afterwards, is being realised in a steadily increasing measure.' কিন্তু এই বোধ যে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম জাগাতে চেয়েছিলেন ১৮৭০ -এর দশকেই, তা খুব স্পষ্ট, এবং সে জেনেই, 'গোরা' উপন্যাসের মধ্যে এই বোধের জাগরণ ঐতিহাসিক দিক থেকেও সঙ্গত মনে হয়।

'গোরা' উপন্যাসটি এইভাবেই শেষ পর্যন্ত দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে হয়ে ওঠে সম্প্রীতির এক সবিশেষ উপাখ্যান। গোরার মুখে উচ্চারিত হয়েছে এই প্রার্থনা : 'আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দুমুসলমান, খ্রিস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বারা কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না— যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।'

'গোরা'-র পরবর্তী উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)। এই উপন্যাসে মুসলিম সমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর মমত্ববোধ লক্ষ্য করা যায়।

মুসলিম সমাজের শ্রেণিহীন সমাজ-বিন্যাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতা এই মমত্ববোধের উৎস। প্রসঙ্গানুক্রমে মুসলমানদের সাহস ও শক্তির কথাও তিনি বলেছেন এখানে। নাস্তিক জগমোহনের ক্রিয়াকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে এই উপন্যাসে। মুসলমান সমাজের হিতসাধনের জন্য তিনি প্রাণদানও করেছেন শেষ পর্যন্ত।

জগমোহন বস্তুবাদী। মানবকল্যাণই তাঁর জীবনের ব্রত। লোকের সুখসাধনের আদর্শ তাঁর এই আদর্শকে সামনে রেখে জগমোহন তাঁর ভাবশিষ্য ভাইপো শচীশসহ পাড়ার অনুন্নত মুসলমান সমাজের 'হিতসাধনে' এগিয়ে আসেন। রক্ষণশীল ভ্রাতা হরিমোহন ও তাঁর পুত্র পুরন্দর এর ঘোর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু জগমোহন অবিচল। তিনি এই মুসলমানদের অন্তঃপুরে আহ্বান করে ভোজের আয়োজন করলেন। পাচক ও পরিবেশক সবই মুসলমান। ভ্রাতা হরিমোহন এর প্রতিবাদ করলে জগমোহন উত্তর, 'তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না। আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব, ইহাতে বাধা দিয়ো না।'

হরিমোহন : 'তোমার ঠাকুর!?

জগমোহন : 'হ্যাঁ, আমার ঠাকুর।'

হরি : 'তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা?'

জগমোহন : 'হ্যাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি।'

পুরন্দর বলপ্রয়োগে এই মুসলিম ভোজপর্বের উদ্যোগ বানচাল করতে চাইলে জগমোহন অতি আস্থার সঙ্গে উত্তর দেন : 'ওরে বাঁদর, আমার দেবতা যে কত বড়ো জাগ্রত দেবতা তাহা তাঁর গায়ে হাত দিতে গেলেই বুঝবি, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না।' জগমোহন মুসলমানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে এদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন বলেই এমন আস্থা প্রকাশ করেছেন। বাস্তবে ঘটলো তাই, মিথ্যা আস্ফালনকারী পুরন্দর 'মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘাঁটাইতে সাহস করিল না— ভোজ নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।'

হরিমোহন এই অনাচারের প্রতিবিধানের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হলে জগমোহন বললেন, 'মুসলমান ব্রহ্মার কোনখান হইতে জন্মিয়াছে তাহা তিনি জানেন না এবং তাহাদের সঙ্গে তাঁর খাওয়া-দাওয়া চলার কোনো বাধা নাই।' এভাবে জগমোহন ও শচীশ সংরক্ষণের যাবতীয় অচলায়তন ভেঙে ফেলেছেন। 'নিরাকার' বা 'সাকার দেবতা' -র পুজার চাইতে সজীব মানবসেবা যে অনেক উন্নত ধর্ম এসত্য তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন ঘরের মাঝখানে অস্পৃশ্য মুসলমানকে আহ্বান করে। এরই ফলে দুই ভাইয়ে ভাগাভাগি হয়ে কলকাতার ভদ্রাসন বাটীর মাঝামাঝি প্রাচীর উঠে গেল।

এ-সময় কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে মুসলমান পাড়া আক্রান্ত হল প্রথম। জগমোহন হাসপাতাল খুললেন। প্রথম রোগিটিই এল মুসলমান। সে মরল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন। মৃত্যুর সময় তিনি শচীশকে বলে গেলেন, 'এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম - কোনো খেদ রহিল না।' জগমোহন মুসলমানদের জন্য প্রাণ দিলেন। শুধু তাই-ই নয়, মৃত্যুর সময় উইল করে গেলেন বাড়ির 'নিচের তলায় পাড়ায় মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইট স্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে।' কিন্তু হরিমোহন তড়িঘড়ি করে বাড়িটা দখল করে ফেললেন। শ্রীবিলাশ এগিয়ে আসেন বাড়িটা উদ্ধার করতে। এই উদ্ধারে তাঁর প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয়, জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখানো হল, শ্রীবিলাসকে আর উকিল বাড়ি হাঁটাহাটি করতে হয়নি। প্রয়োজনে বাহুবলে নিজ অধিকার প্রতিজ্ঞা করবার সাহস মুসলমান রাখে— রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই এ-সত্যটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এখানে। মুসলমানের এই পৌরুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমরা পূর্বেও 'গোরা' উপন্যাসেও লক্ষ্য করেছি। ফরু সর্দারের পৌরুষ গোরাকে অভিভূত করেছিল।

'চতুরঙ্গ'-র শেষ অধ্যায় দেখেছি দামিনী জগমোহনের অপূর্ণ আকাঙ্খার বাস্তব রূপদান করেছে। সে পাড়ার ছোটো ছোটো মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু দামিনীর অকাল মৃত্যুতে সব তছনছ হয়ে যায়।

'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসের মুখ্য অবলম্বন কিন্তু রাজনীতি। রবীন্দ্রনাথ চান আত্মশোধন, তিনি চান আত্মগঠন। তাঁর বিশ্বাস, হাজার যুগের সংস্কারে যারা আচ্ছন্ন, তাদের উত্তেজনার মদিরাপান করে ছোটানো যায় বটে, কিন্তু সে উদ্যম প্রায়শ উপদ্রব এবং শক্তির অপব্যয় মাত্র। ইংরেজদের অত্যাচারকে ঘৃণা করা যায়— কিন্তু ইংরেজকে ঘৃণা করবার অপবুদ্ধি এবং জাতিবৈরতা দেশকে রসাতলে নিয়ে যাবে। দেশের মানুষকে কাপড় জোগাবার শক্তি নেই, অথচ বিলিতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব করে দরিদ্র ব্যবসায়ীর সর্বনাশ করে জনসাধারণকে উলঙ্গ করে রাখবে—এই স্বাদেশিকতা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ব সব সম্পর্কেও নিখিলেশের দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। নিখিলেশ বলেছে, 'প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন করবার জন্যই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবরে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।' আর বিপ্লববাদ? রক্তের পথ তাঁর কাছে চিরদিনই ঘৃণ্য— এক বীভৎস পাপাচার, যা এক অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়ে সহস্র অন্যায়কে আহ্বান করে। এ সম্পর্কে ইউরোপের দৃষ্টান্ত তুলে লাভ নেই। তারা রক্তপাতের পথ ধরে হয়তো অনেকখানিই সিদ্ধিলাভ করেছে। কিন্তু তা দেখেই আমরা অভিভূত হয়ে পড়ব না। এই সত্য যেন আমরা কখনোই ভুলে না যাই যে, আজকের প্রবল শক্তিমত্ততা এবং রক্তপাতের সমস্ত ঋণ একদিন পশ্চিমকে মিটিয়ে দিতে হবে। সুতরাং, 'ঘরে বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য: 'ইউরোপীয় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে অন্ধবেগে এ কোন নীরন্ধ্র অন্ধকারের পথে আমরা সর্বনাশের দিকে ছুটেছি?'

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতিক বোধ দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে দেশের

রাজনৈতিক আন্দোলনের যে-রূপ আমরা দেখতে পাই, তাকে শুধু জাতদীয়তাবাদ না বলে স্বজাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা বলা চলতে পারে। এই জাতীয়তাবোধ পৌরাণিক হিন্দুত্বের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও এই হিন্দু জাতীয়তার কথাই রয়েছে। তিলক, অরবিন্দ বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি চরমপন্থী নেতারা যে পথ অনুসরণ করে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন, তাও যেন ধর্মনিরপেক্ষ নয়। দেশের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিরা যেভাবে হিন্দুদের ধর্মভাবালুতাকে উত্তেজিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত করেছিলেন, তাতে একটা মস্তবড় ত্রুটি থেকে গিয়েছিল যে, দেশের অহিন্দু জাতিরা নিজেদের ধর্মবিরোধী কোনোও কিছুকেই অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে পারেনি।

'বন্দেমাতরম্' সংগীতকে জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করে দেশকে দেবীর আসনে বসিয়ে আরাধনা করা হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হলেও মুসলমানদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। এই ধরনের উৎকট স্বাদেশিকতা, যা দেশের ওপরে আর কোনও কিছুকেই মানতে চায় না, যার কাছে ন্যায় ধর্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা, রবীন্দ্রনাথের তা মনঃপুত ছিল না; এবং যারা বলতে চায়, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্যে যা করা যাবে তা' অধর্ম হতে পরে না— তাদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের মতের কোনো মিল ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্বমানবিকতার কোনও ভেদ নাই। ১১ ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন থেকে পিয়রসনকে লিখিত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '...দেশপ্রেমের অহংকার আমার জন্য নয়। এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে সর্বত্র আমি আমার ঘর খুঁজে পাব, এই একান্ত আশা আমার আছে।' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭০, পৃ. ৩১৬) সমগ্র বিশ্বের ভাবনা থেকে দেশের ভাবনাকে বিচ্ছিন্ন করে যে সার্থকতা লাভ করা যায় না, একথা কবি বার বার বলেছেন।

ইউরোপীয় ন্যাশন্যালিজমকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন মানেনি। রবীন্দ্রনাথের যে জাতীয়তাবাদ তাকে আন্তর্জাতিয়তা বা ইন্টারন্যাশনালিজম্ বলা যেতে পারে। পাশ্চাত্য জগতে ন্যাশনালিজ্‌মের যে ভয়ঙ্কর রূপটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তাতে ভীত হয়ে জগতের সম্মুখে তিনি ঘোষণা করলেন, 'এই জাতীয়তা শুধু যে মন্দ তাই নয়, এ একটি মহামারীর মতো, যা বর্তমান যুগের মানব সমাজের ওপর ছড়িয়ে পড়ে তার নৈতিক শক্তি ধ্বংস করেছে।' (ন্যাশনালিজম ইন দ্যা ওয়েস্ট : ন্যাশানালিজম্ পৃ. ১৬) 'নৈবেদ্যে'র কবিতায় তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচন্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়।'

'ন্যাশানালত্বের' চেয়ে মনুষ্যত্বকে কবি অনেক ওপরে স্থান দিয়েছেন। 'ন্যাশনালত্বে'র মধ্যে একটা বিরাট স্বার্থপরতা রয়েছে যা মানুষকে ক্রমেই সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে। 'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন, 'ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে খাড়া করিলেই বিরোধের আদর্শকে খাড়া করা হয়— সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি কোনও কালে ইউরোপের মহাকাব্য স্বার্থদানবের সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারিব?'

স্বদেশি যুগে বিলিতি বস্তু ব্যবহারের বিরুদ্ধে দেশময় যে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় যে কাপড় পোড়ানোর আয়োজন চলছিল, তার ফল কখনই শুভ হতে পারে না তা রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। এই ধ্বংসমূলক কাজের প্রতি তাঁর পরম বিদ্বেষ ছিল। তিনি বলেছেন, '...এখনকার লোকে তাই তিলে তিলে কিছু গড়ে তোলবার জন্যে দল বাঁধে না। দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে।' (রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত : শনিবারের চিঠি, ৩৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায়, মাঘ ১৩৭০)

দেশের একশ্রেণির লোক যে সে-সময়কার স্বদেশির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী উঠেছিল, স্বদেশি প্রচারকের দল উপস্থিত প্রয়োজনের তাগিদে তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ গঠনমূলক কাজে বিশ্বাস করতেন, ধ্বংসমূলক কাজে নয়। উত্তেজনার দ্বারা কখনও কার্য সিদ্ধি হতে পারে না। কবি লিখেছেন, 'উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল, এবং আড়ম্বর কর্ম নষ্ট করিবার শয়তান। আজ নানা স্থানে নানা কাজে লইয়া আমরা নানা লোকে যদি লাগিয়া থাকি তবেই গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস আমাদের পাকা হইতে থাকিবে। এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে।' (ব্যাধি ও প্রতিকার)

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিখিলেশ। তার আচার আচরণে জমিদার রবীন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। নিখিলেশের বিশ্বস্ত চাকর হল কাসেম সরদার। কাসেম চুরির দায়ে পুলিশ কর্তৃক ধৃত, এ নিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে নিখিলেশের কথোপকথনে নিখিলেশের কাসেমের প্রতি গভীর বিশ্বাসের সুর ফুটে ওঠেছে।

নিখিলেশ ব্যক্তিগত উদ্যোগেই দেশ ও মানুষের কল্যাণধর্মে ব্রতী। ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচুর ভেদ আছে এবং তা যে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিরোধী তা নিখিলেশকে পীড়িত করেছে। নিখিলেশ বলেছে, 'আমার মধ্যে বোধ হয় গুহক এবং একলব্যের রক্তের ধারাটাই প্রবল; আজ যারা আমার নীচে রয়েছে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারি নে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি নীচের লোক যত নামছে ভারতবর্ষ তত নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে'।

নিখিলেশ অসাম্প্রদায়িক, পরিচালিত হয়েছে উদার ধর্মবোধের দ্বারা। তার কথা হচ্ছে, '...মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গরুই যদি অবধ্য হয় আর মেঘ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধসংস্কার।...মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্ছে, ধর্ম যে এমনি করেই বিচার করেন। আমরা যা এতকাল ধরে জমিয়েছি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে'।

যাইহোক, এই উপন্যাসে উগ্র জাতীয়তাবাদ, অন্ধ সন্ত্রাসবাদের পাশাপাশি এখানে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপরও তীব্র

আলো ফেলেছেন। স্বদেশি ভাবনা এবং বিলাতি পণ্য বর্জনের ঘটনায় এই সম্পর্ক প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছে। বাংলার চাষ-নির্ভর অর্থনীতিতে মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রবল ভূমিকাটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অবহিত ছিল নিখিলেশও। সে স্বভাবতই মনে করত ওই বৃহত্তর মুসলমান - কৃষক সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে দেশের রাজনীতি গড়ে উঠতে পারে না। কেবল সন্দীপকেই নয়, তার প্রজাদেরও সে এ-কথা বোঝাতে চেয়েছে। নিখিলেশের আত্মকথায় :

'ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকায় মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দু-এক জায়গায় গোরু-জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবর পাই। এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবার বুঝলুম, ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপারটার মুলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। সেইটেই তো আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।

আমার প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কী? মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।

তারা বললেন, মহারাজ, এতদিন তো এ-সব উপসর্গ ছিল না।

আমি বললুম, ছিল না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথেই দেখো। সে তো ঝগড়ার পথ নয়

তার বললেন, না মহারাজ, সেদিন নেই। শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বললুম, শাসনে গোহিংসা তো থামবেই না, তার উপরে মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।'

রবীন্দ্রনাথের এখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাতাস ছাড়াবার জন্য জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতিকেই দায়ী করে নিখিলেশের মাধ্যমে। স্পষ্ট করে বলেন, দেশদেবী ও দেশধর্মের নামে সেই রাজনীতি ইংরেজ-বিরোধিতার ছদ্মবেশ আসলে আত্মস্বার্থ বজায় রাখার জন্য জনসমাজকেই চায় অধীনস্থ রাখতে।

সাহিত্য - সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ভারতবর্ষ সত্য হলে, মুসলমান নিয়েই সত্য—দেশ দেবী নয়, সত্য দেশের থেকেও বড়ো; নিখিলেশের এই যুক্তিতে আর এক রাজনীতির আভাস।গোরা বা নিখিলেশ কেউই স্পষ্টতই শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতির কথা বলে না। কিন্তু তাদের ভাবনায় প্রচ্ছন্ন থাকে এটাই; শ্রেণি সংগ্রামকে হয়তো তারা প্রকাশ্যে আনে না, কিন্তু গোরার প্রতিবাদের ধরণ, নিখিলেশের পঞ্চু - চাষির চেতনায় সেটাই আসে। রবীন্দ্রনাথ খুব খোলাখুলিই দেখান সন্দীপের শিক্ষিত শ্রেণির রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতাই চাষিকে বিরুপ করে, মুসলমানদের মধ্যে পাল্টা সাম্প্রদায়িকতা জাগায়। জনসমাজ আরও বিপন্ন হয়ে ওঠে। (পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস রাজনৈতিক)।

নিখিলেশ সারা জীবন তার সামনে ঘনীভূত সমস্ত সমস্যা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে, মোকাবিলা করেনি, মুখোমুখি হয়নি, আদর্শের ঘোরাটোপে থেকেছে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত তাকে সমস্যার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিয়েছেন। উপন্যাসের পরিণতিতে বিমলা তার আত্মকথায় জানাচ্ছে :

'সন্দীপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, আমার সময় নেই নিখিল। খবর পেয়েছি মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখার মতলব করেছেন। কিন্তু আমার বেঁচে থাকা দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে অতএব এখনকার মতো চললুম। তারপরে আবার একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দেব। যদি আমার পরামর্শ নাও, তুমিও বেশি দেরি কোনো না। মক্ষীরাণী, বন্দে প্রলয়রূপিনীং হৃদপিন্ডমালিনীং।

এই বলে সন্দীপ প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। গিনি আর গয়নাগুলো যে কত তুচ্ছ সে আর কোনোদিন এমন করে দেখতে পাইনি। কত জিনিস সঙ্গে নেব, কোথায় কী ধরাব, এই কিছু আগে তাই ভাবছিলুম, এখন মনে হল কোনো জিনিসই নেবার দরকার নেই— কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার।

আমার স্বামী চৌকি থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বললেন, আর তো বেশি সময় নেই, এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক। এমন সময় চন্দনাথবাবু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সংকুচিত হলেন; বললেন, মাপ কোরো মা, খবর দিয়ে আসতে পারিনি। নিখিল, মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেছে। হরিশ কুন্ডুর কাছারি লুঠ হয়ে গেছে। সেজন্য ভয় ছিল না। কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না।

আমার স্বামী বললেন, আমি তবে চললুম।

আমি তাঁর হাত ধরে বললুম, তুমি গিয়ে কী করতে পারবে? মাস্টারমশায়, আপনি ওঁকে বারণ করুন।

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, মা, বারণ করবার তো সময় নেই।

আমার স্বামী বললেন, কিছু ভেবো না বিমলা।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্র ছিল না।'

রবীন্দ্রনাথ এখানে একটা অকিঞ্চিৎকর, সামান্য, সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে কত সুদূর প্রসার ঘটিয়ে দিলেন এই উপন্যাসের, তা আজ আর নতুন করে বলার নয়। 'হাতে তাঁর কোনো অস্ত্র ছিল না।' বাক্যটি আমাদের বুঝিয়ে দেয় নিখিলেশ দাঙ্গা-দমনে কতটা সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হতে পেরেছিল, গোটা উপন্যাসে সে তার নিষ্ক্রিয় ভাবুকতার যে ক্রম-প্রসার ঘটিয়ে গিয়েছে, আজ তা সর্বাংশে সক্রিয় হল। কেবল তা-ই নয়, ওই একটি বাক্যে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দেশে অহিংস আন্দোলনের তাৎপর্যও। বুঝিয়ে দেন, সন্ত্রাসবাদীদের শেষ পর্যন্ত সন্দীপের মতো পালিয়ে বাঁচতে হয়, আর মানসিক-বলীয়ান নিখিলের মতো অহিংসবাদীরা সন্ত্রাস বা দাঙ্গা রুখতে অস্ত্রহীন ঝাঁপিয়ে পড়তে

পারে মৃত্যুর মুখে।

উপন্যাসের শেষে হরিশ কুন্ডুর বাড়ির মেয়েদের উপরে মুসলমান দাঙ্গাকারীদের অত্যাচারের খবর পেয়ে নিখিলেশ এই যে তার মোকাবিলায় ছুটে যায়, তার পিছনে রয়েছে তার উদারনৈতিক মানবতাবোধ। এ বিষয়ে তার পূর্বসূরী নিঃসন্দেহে গোরা, যে জাতীয়তাবোধের প্রশ্নে খন্ডিত হিন্দুত্বের ধারণার ঊর্ধ্বে বৃহত্তর মানবিকতায় উন্নীত। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের আবর্ত থেকে বের হয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সার্বিক মিলনের ভাবনাটাই আন্দোলিত হয়েছিল। গোরা ও নিখিলেশ সেই চিন্তারই ফসল।

'চার অধ্যায়' (১৯৪০) উপন্যাসের অতীনও নিখিলেশকেই অনুসরণ করেছে—উগ্র জাতীয়তাবাদের প্যাট্রিয়টিজমে তারও নিখিলেশের মতো আস্থা নাই। বিপ্লব প্রচেষ্টার ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে অবস্থান করতে করতেই সে এই বোধে উপনীত হয় যে, স্বদেশীরা যাকে পেট্রিয়ট বলে সে-ই পেট্রিয়ট নয় শুধু। অতীন বলেছে, 'পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকো! মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পকে অবিশাস, ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তের ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথার বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারবে না, যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়!'

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

রবীন্দ্ররচনাবলি, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৫

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ১-৪

খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬৭-১৩৭১। আবুল ফজল, 'বাংলা ভাষার আরবি-ফারসি শব্দ;

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ, 'সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন', ঢাকা।

প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্য : মুসলিম চরিত্র পরিবার ও সমাজ, বাংলা একাডেমি ঢাকা ১৯৯১।

কার্তিক লাহিড়ী, বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি কলকাতা।

কমল সমাজদার, বাংলা উপন্যাসে লোকজীবন চর্চা, কলকাতা

বাসব সরকার, রবীন্দ্র উপন্যাস সামাজিক নিম্নবর্গ: গোরা (প্রবন্ধ), পরিচয় শারদীয়া ১৪০৮, কলকাতা

বাসব সরকার, বঙ্গজীবনের দুই শতক : বাঙালি মনন ও অন্বেষণ, সোসাইটি ফর প্রগ্রেসিভ আর্গুমেন্টেশন অ্যান্ড কালচার এক্সচেঞ্জ (স্পেস), কলকাতা, সল্টলেক ২০০৪।

অনিসুজ্জামান সম্পাদিত, রবীন্দ্রনাথ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮।

অর্চনা মজুমদার, রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা, দেজ, কলকাতা, ২০০৫

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্রসারিত রবিচ্ছায়া, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা। ২০০৬

শতবর্ষোত্তর সমীক্ষা, গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা, ২০০৭

অশোককুমার মিশ্র, উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, দেজ, কলকাতা, ২০০৯

সুধাময় দাস, বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ। মনন প্রকাশ, ঢাকা ২০০৮।

গৌতম ঘোষদস্তিদার, ভেদাভেদের কথাসাহিত্য, পুস্তক বিপণী, কলকাতা ২০০৪

অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮৮।

ড. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, রবীন্দ্র চেতনায় মুসলিম সমাজ, চারুবাক, কলকাতা ১৯৯০।

কামাল উদ্দিন হোসেন, রবীন্দ্র ও মোগল সংস্কৃতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৮।

ড. কৃষ্ণগোপাল রায়, সাম্প্রদায়িকতা ও রবীন্দ্রনাথ, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, ২০০৪।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭০।